ইন সার্চ অফ অ্যা

সিক্রেট হিস্ট্রি

আবদুল বারি আতওয়ান

ইন সার্চ অফ অ্যা

সিক্রেট হিস্ট্রি

ভাষান্তর

সিদ্দিক ইবনে মুসা

রেডলাইন

ইন সার্চ অফ অ্যা সিক্রেট হিস্ট্রি
আবদুল বারি আতওয়ান
ভাষান্তর
সিদ্দিক ইবনে মুসা
প্রকাশক ও সম্পাদক
এম এ রহমান
প্রকাশকাল
জাতীয় বইমেলা ২০২১

প্রকাশনা
রেডলাইন
বাংলাবাজার, ঢাকা
পরিবেশক
পড় প্রকাশ
৩৭ নর্থব্রুক হল রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা
বাংলার প্রকাশন
১০৬ ফকিরাপুল, ঢাকা
অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, ওয়াফিলাইফ, নিয়ামাহ শপ, ইস্তিকামাহ শপ,
বইজগৎ, পথিকশপ ডটকম, মোল্লার বই ডটকম
খুচরা মূল্য : ৪৭০ টাকা মাত্র

In Search of a Secret History
By Abdel Bari Atwan
Translated by Siddiq Ibn Musa
Published by : redline
E-mail : redlinebook21@gmail.com
fb/redlinepublications

***

***

উৎসর্গ

লেখকের উৎসর্গ

আমার পরিবারের প্রতি—বাসিমা, খালেদ, নাদা এবং করিম।

আমার মা জারিফা আতওয়ানের স্মরণে, যিনি ২০০৩ সালের আগস্ট মাসে গাজা উপত্যকার রাফাহ্ শরণার্থী শিবিরে ইনতেকাল করেন।

* * *

অনুবাদকের উৎসর্গ

আব্বু এবং আম্মু—যাদের হাতে আমার লেখাপড়ার হাতেখড়ি...

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

ওসামা বিন লাদেন

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধর্মযোদ্ধা

তৃতীয় অধ্যায়

আদমবোমা এবং শাহাদাত

চতুর্থ অধ্যায়

সাইবার জিহাদ

প ঞ্চ ম অ ধ্যা য়

আল-কায়েদা ইন সৌদি আরাবিয়া

ষ ষ্ঠ অ ধ্যা য়

আল-কায়েদা ইন ইরাক

স প্ত ম অ ধ্যা য়

আল-কায়েদা ইন ইসলামিক মাগরেব

অষ্টম অধ্যায়

আল-কায়েদা ইন ইউরোপ

নবম অধ্যায়

আল-কায়েদার ভবিষ্যৎ

প্রকাশকের কথা

দুনিয়ার আরও হাজারটা টপিক থাকতে বই প্রকাশের জন্য এমন জটিল আর বিপজ্জনক একটা টপিকে বেছে নেন যখন কোনো প্রকাশক, তখন তিনি এর কৈফিয়ত দেওয়ার দায়টাও এড়াতে পারেন না। মূলত সেই দায়বদ্ধতা থেকেই দুটি কথা বলতে চাই।

বলাবাহুল্য যে অনেক ভেবেচিন্তেই আমার প্রকাশনার ক্যারিয়ার শুরু করেছি এই বইটি দিয়ে; কিংবা আরও সুনির্দিষ্টভাবে বললে এই বিষয়টি দিয়ে। 'টেররিজম', 'ওয়ার অন টেরর', 'ইসলামিক মিলিট্যান্সি', 'ইসলামিক জিহাদ', বা 'গ্লোবাল ইসলামিক জিহাদ'—যাই বলা হোক না কেন; প্রত্যেকে নিজস্ব চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির জায়গা থেকে বিবিধ অভিধায় চিহ্নিত করলেও বিষয় মূলত একটাই। সংশ্লিষ্ট-বিষয়ে এটাই আমাদের প্রথম বই এবং আশা করি এই কন্টেন্টের ওপর আরও কিছু কাজ রেডলাইন থেকে আসবে। যাইহোক এবার কৈফিয়তের দিকে যাওয়া যাক।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তারিখটি বিশ্ব ইতিহাসের অন্যতম স্মরণীয় একটি দিন। প্রবল প্রতাপশালী আমেরিকার জন্য যারপরনাই বিপর্যয় আর দুর্ভোগ ডেকে আনে এই দিনটি। মুহূর্তেই বিশ্ব-রাজনীতির অনেক হিসেব-নিকেশ উল্টে যায়। আমূল বদলে যায় ভবিতব্য ইতিহাসের মানচিত্র।

ঘটনাটি ঘটার পর, ৭ অক্টোবর ২০০১ তারিখে প্রেসিডেন্ট বুশ জাতির উদ্দেশে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে ঘোষণা করেন ঐতিহাসিক 'ওয়ার অন টেরর' বা 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অনন্ত যুদ্ধ'। তার সেই ভাষণে মোটাদাগে দুইটি ব্যতিক্রমধর্মী বার্তা চিহ্নিত করা যায়। প্রথমত তিনি ইঙ্গিত করেন—এটি সাময়িক যুদ্ধ না হয়ে একটি প্রলম্বিত ও দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধ হতে যাচ্ছে; যা আমেরিকানদের দেখা অন্য যুদ্ধগুলো থেকে ব্যতিক্রম। দ্বিতীয়ত, তিনি এই যুদ্ধকে একটা বৈশ্বিক যুদ্ধের মতো করে চিত্রায়িত করেন। স্পষ্টতই হুমকির সুরে তার ঘোষণা বিবৃত হয়—'এই অঞ্চলের প্রতিটি জাতিকে এখন একটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আপনারা হয়তো আমাদের সাথে থাকবেন, নয়তো সন্ত্রাসীদের পক্ষে। সন্ত্রাসীদের প্রশ্রয় দেওয়া প্রতিটি দেশ আমাদের শত্রু বলে বিবেচিত হবে।'

প্রেসিডেন্ট বুশের এই পদক্ষেপ কতটা বুদ্ধিদীপ্ত ছিল, তা ইতিহাস তার পৃষ্ঠায় লিখতে শুরু করেছে। তবে এ কথা সত্য যে, তার প্রতিটি বক্তব্য, হুমকি ও হুঁশিয়ারি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবেই পালিত হয়েছিল। পৃথিবীর সকল জাতি ও রাষ্ট্র

সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ও আমেরিকার পক্ষে দাঁড়িয়েছে। প্রায় দুই দশক যাবৎ এই যুদ্ধ প্রলম্বিত হয়েছে।

কিন্তু এরপর? কার কী অর্জন, আর কার কী বিসর্জন, তা সম্ভবত খুব দ্রুতই স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। বিশেষত যখন ২০১৯ এর শেষ দিক থেকে আমেরিকা সরাসরি তালেবানের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসতে শুরু করে এবং হোয়াইট হাউজের বিভিন্ন বিবৃতিতে তালেবানের 'টেররিস্ট' বা 'সন্ত্রাসী' হওয়ার বিষয়টিকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। সম্ভবত ২০১৫ সালের শুরুর দিকে হোয়াইট হাউজের তৎকালীন ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি এরিক শুলজ 'তালেবান সন্ত্রাসী গোষ্ঠী কি-না' সাংবাদিকদের এমন এক প্রশ্নের জবাবে প্রথমে ঘোষণা করেন—'আমি তালেবানদের সন্ত্রাসী গোষ্ঠী মনে করি না, তারা সশস্ত্র বিদ্রোহী।' এরপর থেকেই এই ধরনের ঘোষণা বারবার আমরা শুনেছি।

এ পর্যায়ে আমাদের সামনে কিছু মিলিয়ন ডলারের প্রশ্ন এসে দাঁড়ায়, যেগুলোকে আমরা কোনোভাবেই এড়িয়ে যেতে পারি না। তাহলে কি আমেরিকার 'টেরোরিজম' ও 'সন্ত্রাসবাদে'র সংজ্ঞা বদলে যাচ্ছে? আমেরিকা কি তাদের ঘোষিত ওয়ার অন টেররে হেরে যাচ্ছে? এই যুদ্ধে আমেরিকার পরাজয় মানে পুরো পৃথিবীর মার্কিন মিত্রদের পরাজয়, তাহলে কথিত এই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক পরাজয়-পরবর্তী পৃথিবীর অবস্থা কেমন হবে?

বলাবাহুল্য যে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর সময়ই বলে দেবে, তবে সেই সময়কে মোকাবিলা করার জন্য আমাদের আগ থেকেই প্রস্তুত থাকতে হবে। ফলে, 'জঙ্গিবাদ', 'সন্ত্রাসবাদ', 'জিহাদ', 'গ্লোবাল জিহাদ' ইত্যাদি ধারণা ও প্রবণতার বিষয়ে পশ্চিমা বয়ানের বাইরে আমাদের নতুন বোঝাপড়া তৈরি করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট-বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে পুনর্চিন্তা, পুনর্ভাবনা ও পুনর্মূল্যায়নের অবকাঠামো তৈরি করা। আমাদের উচিত এসব বিষয়ে পশ্চিমের তৈরি করা গতানুগতিক বয়ানের বাইরে আমাদের নিজস্ব বয়ান তৈরি করা। কারণ, পশ্চিম নিজেই তার বয়ান থেকে সরে আসতে শুরু করেছে। আর ঠিক এই ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারবে আশা করি আমাদের এই বই, এটাই আমাদের উদ্দেশ্য, বাসনা ও কৈফিয়ত।

বাংলা ভাষায় এই টপিকে যত বই এসেছে, তার অধিকাংশই বলতে গেলে পশ্চিমা বুলিবাগিশতার সারাংশ। সেই তুলনায় আতওয়ানের লেখা অনেক বেশি নির্মোহ, বস্তুনিষ্ঠ ও তাত্ত্বিক।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এখানে আল-কায়েদার জন্মলগ্ন থেকে ২০০৭ পর্যন্ত সময়ের ঘটনাবলি আলোচিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে। এই ধারাবাহিকতায় লেখা

আতওয়ানের পরবর্তী বইগুলোও আমরা খুব শীঘ্রই পাঠকদের সমীপে উপস্থিত করতে আগ্রহী ইনশাআল্লাহ।

প্রিয় পাঠক, এই বইটি পড়ার পর আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন আমরা আমাদের উদ্দেশে কতটা সফল। তবে এ কথা জোর দিয়েই বলতে পারি, বইটি পড়ার পর আপনি বলতে বাধ্য হবেন সংশ্লিষ্ট-বিষয়ে এটি অনন্য এবং ব্যতিক্রম একটি কাজ। বইয়ের শৈল্পিক বর্ণনাভঙ্গি, গতিময় ধারাবিবরণী, গল্পের ফাঁকে ফাঁকে তত্ত্ব ও বিশ্লেষণের নৈপুণ্য আপনাকে মোহাবিষ্ট করে তুলবে। এর প্রতিটি অধ্যায় একেকটি অন্ধকার দরজা পেরিয়ে আপনাকে নিয়ে যাবে এমন এক গভীর ও রহস্যময় জগতে, যেখানে সর্বসাধারণের প্রবেশ নিষেধ।

১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২১
এম এ রহমান
প্রকাশক ও সম্পাদক
রেডলাইন
redlinebook21@gmail.com

অনুবাদকের কথা

পৃথিবীব্যাপী যখন 'করোনা ভাইরাস' মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে, তখন ৮ মার্চ ২০২০ জানা গেল বাংলাদেশেও থাবা বসিয়েছে এই মরণঘাতী ভাইরাস। ১৬ মার্চ বন্ধ করে দেওয়া হলো সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। করোনা আতঙ্কে তখন ঘরবন্দি জীবনযাপন করছি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় পড়াশোনাও দ্রুতই লাটে উঠে। সময় কাটতে থাকে গল্প, উপন্যাস, নন-ফিকশন, আর্টিকেল ইত্যাদি পড়ে কিংবা আল-জাজিরা, ভাইস, টিআরটি, সিএনএন, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক এর ডকুমেন্টারি দেখে। অনলাইন নিউজ পোর্টালেও কদাচিৎ ঢুঁ মারা হয়। (অতি সামান্য; কারণ কোভিড-১৯ বাদে অন্য কোনো নিউজ তখন থাকত না বললেই চলে)

হঠাৎ ৫ মে বিবিসি বাংলার একটি নিবন্ধে চোখ আটকে গেল, যার শিরোনাম ছিল 'ব্ল্যাক সোয়ান' বা 'কালো রাজহাঁস তত্ত্ব'। খুব সহজ করে বলতে গেলে, যেসব ঘটনাকে 'ব্ল্যাক সোয়ান' বলে চিহ্নিত করা হয়, তার কিছু বৈশিষ্ট্য এমন—

- যা ঘটে খুবই আচমকা, কোনো পূর্বাভাস ছাড়া। একেবারেই আন-প্রেডিক্টেবল।
- এসব ঘটনার ব্যাপ্তি এবং ভয়াবহতা গোটা বিশ্বকে নাড়িয়ে দেয়।
- বিশ্ব ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ বাঁক বদলের সূচনা করে এবং এসব ঘটনার প্রভাব হয় সুদূরপ্রসারী।

নিবন্ধটির তালিকাভুক্ত গত তিরিশ বছরের সবচেয়ে বড় পাঁচটি ব্ল্যাক সোয়ান ইভেন্টের ক্ষেত্রে এসব বৈশিষ্ট্য একেবারেই স্পষ্ট; যার পঞ্চম নম্বরটি হলো 'করোনা মহামারি'।

অপর চারটির মধ্যে 'আরব বসন্ত', '২০০৮ সালের অর্থনৈতিক ধ্বস', 'সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন' ব্ল্যাক সোয়ান ইভেন্টের সাথে সাদৃশ্য জ্ঞাপন করতে পারলেও যে জিনিসটি আমার চিন্তাজগৎকে ঘোলা করে দেয় সেটা হলো 'নাইন ইলেভেনের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের হামলা'। কিন্তু কোনো জঙ্গি হামলা কীভাবে বিশ্ব ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ বাঁক বদলের সূচনা করতে পারে?

উক্ত প্রতিবেদনে নাইন ইলেভেনকে ব্ল্যাক সোয়ানের আওতায় আনার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে—'যদি সাম্প্রতিক বিশ্ব ইতিহাসে পূর্বের যুগের সঙ্গে পরবর্তী যুগের পরিষ্কার ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছে এমন একটি মুহূর্তের কথা বলতে হয়, তবে বলা যায় সেই মুহূর্তটি হচ্ছে, ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর সকাল ৮টা বেজে ৪৬মিনিট, ৪০সেকেন্ড। দিনটি ছিল মঙ্গলবার। নিউইয়র্কের আকাশ ছিল নীল,

রোদে ঝলমল। আমেরিকান এয়ারলাইন্সের বোয়িং সেভেন-সিক্স-সেভেন ঠিক ওই মুহূর্তটিতে সোজা এসে আঘাত করে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের নর্থ টাওয়ারে। নাইন-ইলেভেন অ্যাটাকের আগে যুক্তরাষ্ট্রের ধারণাই ছিল না তারা এমন ভয়াবহ হামলার শিকার হতে পারে। ১১০ তলা ভবনটির ৮০তম তলার কাছে এক বিরাট গর্ত তৈরি করে এটি ঢুকে পড়ে ভেতরে, ২০ হাজার গ্যালনের জেট ফুয়েলসহ বিস্ফোরিত হয়। সেই একটি মুহূর্তেই নির্ধারিত হয়ে গেল বিশ্বের পরবর্তী কয়েক দশকের অনেক কিছুর গতিপথ। যদিও ওসামা বিন লাদেন এই ঘটনার আগ থেকেই আমেরিকার 'মোস্ট ওয়ান্টেড' তালিকাভুক্ত ছিল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তখনও ওসামা বিন লাদেন কিংবা আল-কায়েদা নামে কিছু চিনত না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন প্রতিরক্ষা এবং পররাষ্ট্রনীতির প্রধান লক্ষ্য যেখানে ছিল কমিউনিজম ঠেকানো, নাইন-ইলেভেন পরবর্তী সময়ে কমিউনিজমের জায়গাটি দখল করে নেয় জঙ্গিবাদ। সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের নামে ইসলামি জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে অনন্ত লড়াইয়ে নামে বুশ প্রশাসন।

আফগানিস্তানে তালেবানের বিরুদ্ধে লড়াই দিয়ে শুরু হয়েছিল এই 'ওয়ার অন টেরর', যার পরবর্তী টার্গেট হয়েছিল ইরাক। এখনো অব্যাহত এই যুদ্ধের পেছনে যুক্তরাষ্ট্র খরচ করেছে শত শত কোটি ডলার, প্রাণ গেছে লাখ লাখ মানুষের, কিন্তু এটির শেষ এখনো দেখা যাচ্ছে না।' মোটামুটি এমনটিই ছিল নিবন্ধের বিবরণ।

কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় তৃষ্ণা নিবারণ হয় না আমার। এ দিকে সামনে যত দূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায় তাতে কেবল করোনা আতঙ্ক এবং অখণ্ড অবসর; পরীক্ষা নেই, টিউশন নেই;—থাকার মধ্যে আছে কেবলই বই, ডকুমেন্টারি ফিল্ম এবং রুটিনমাফিক ফেইসবুকিং।

'ওয়ার অন টেরর', 'আল-কায়েদা', 'বিন লাদেন' 'নাইন ইলেভেন' সম্পর্কে জানার জন্য ইউটিউব ডকুমেন্টারির পাশাপাশি তাই দ্বারস্থ হলাম Michael Scheuer, Jason Burke, Steve Coll, Lawrence Wright, Rohan Gunaratna, Abdel Bari Atwan প্রমূখের গবেষণালব্ধ বইসমূহের। এসব অধিকাংশই ছিল তথ্যবহুল এবং সমৃদ্ধ। তবে একেবারেই ভিন্ন ফ্লেভারের ছিল আবদুল বারি আতওয়ানের 'The Secret History of Al Qai'da'। বইটিকে উপর্যুক্ত সবগুলো বিষয়বস্তুর সারাংশ বললে অত্যুক্তি হবে না মোটেও। লেখক এখানে অত্যন্ত নির্মোহ ও নিরপেক্ষতা বজায় রেখে বিন লাদেন ও আল-কায়েদার পুরো ইতিহাসকে বিবৃত করেছেন। তিনি কেন এই বই লিখতে গেলেন? আতওয়ান জানাচ্ছেন—'আল-কায়েদা এজেন্ডাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে সমর্থন করি না। এই নেটওয়ার্কটির বিভিন্ন দিক আলোচনার মাধ্যমে—যেটা এত গভীরভাবে এর পূর্বে আমি কখনো আলোচনা করিনি—আমি কেবল চাচ্ছি

সেগুলোকে সকলের সামনে উন্মোচিত করতে এবং যেখানে সম্ভব এর পেছনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দাঁড় করাতে। আল-কায়েদা এবং এর নেতাদের নিয়ে আমার প্রত্যক্ষদর্শী জ্ঞান, আল-কায়েদা ক্যাম্প পরিদর্শন ও এর প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার এবং অনেক বছরের পর্যবেক্ষণ, অধ্যয়ন, অভিজ্ঞতার ফলাফল হলো এই বক্ষ্যমাণ বই।' লেখক মহোদয় তার এই বইয়ে আল-কায়েদার বিভিন্ন কার্যক্রম, কর্মপন্থা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে এর হাইপ্রোফাইল নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে বিন লাদেনের বিভিন্ন ভাষ্য ও বিবৃতির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। আল-কায়েদা ইন অ্যারাবিয়ান পেনিনসুলা, আল-কায়েদা ইন দ্য ল্যান্ড অফ টু রিভার্স, আল-কায়েদা ইন ইসলামিক মাগরেব, আল-কায়েদা ইন ইউরোপসহ এই মুভমেন্টের অন্যান্য আঞ্চলিক ফ্র্যাঞ্চাইজি; প্রত্যেকটির প্রধান নেতৃবৃন্দ, স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য, কর্মপন্থা ও স্ট্রাটেজির আলাদা বিবরণ দিয়েছেন। এ ছাড়াও প্রাসঙ্গিক আরও বহু কিছু উল্লেখ করেছেন, যার অধিকাংশই প্রায় আমাদের কাছে অজানা।

আশ্চর্য হলেও সত্য যে, লেখকের মতে আমেরিকা ও তার পশ্চিমা মিত্ররা আল-কায়েদাকে প্রতিহত করার জন্য যেসব কলাকৌশল ও প্রচেষ্টা ব্যয় করছে, সেগুলোই আল-কায়েদাকে দিন দিন আরও শক্তিশালী করছে, তাকে ছড়িয়ে দিচ্ছে দিক-দিগন্তে। মূলত প্রাচ্যে পশ্চিমের আগ্রাসী নীতিই আল-কায়েদার জন্ম দিয়েছে, তাকে টিকিয়ে রেখেছে এবং তার শক্তি ও রসদের জোগান দিচ্ছে। তাই যতদিন মধ্যপ্রাচ্যে ও অন্যান্য মুসলিম ভূখণ্ডে পশ্চিমা দখলদারির নীতির অবসান না হবে, ততদিন কেবল আল-কায়েদার উপস্থিতিই থাকবে না, বরং এর শক্তিও অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

বইটির লেখক ফিলিস্তিনের এক শরণার্থী শিবিরে জন্ম নেওয়া আবদুল বারি আতওয়ান লন্ডনভিত্তিক অ্যারাবিক নিউজ এজেন্সি আল-কুদস আল-আরাবির প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের একজন, এবং দীর্ঘ প্রায় দুই যুগ যাবৎ তিনি এর সম্পাদক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তার সাংবাদিক জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি—যা তাকে খ্যাতির শীর্ষ চূড়ায় আরোহণ করিয়েছে; তা ছিল বিন লাদেনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ। পশ্চিমা ঘরানার একমাত্র সাংবাদিক তিনি, যিনি আল-কায়েদা প্রধানের সঙ্গে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন তার প্রধান ঘাঁটি তোরাবোরার দুর্গম্য পাহাড়ি গুহায়—প্রায় তিন দিন। এ সময় তিনি তাকে কাছ থেকে দেখেছেন, তার মুখ থেকে নিজের অতীত কার্যকলাপ এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা শুনেছেন।

সাক্ষাৎকারের ঘটনাটির ১৯৯৬ সালে। এই ঘটনার পর থেকে লেখক বিন লাদেনের ব্যক্তিত্ব ও তার প্রতিষ্ঠিত গ্লোবাল জিহাদিস্ট মুভমেন্ট 'আল-কায়েদা' সম্পর্কে ব্যাপক আগ্রহী হয়ে ওঠেন। অতঃপর দীর্ঘ এক দশকের বিস্তৃত গবেষণার

পর *The Secret History of Al Qai'da* নামে তার এই বিখ্যাত গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় এবং বেশ সাড়া জাগায়।

বইটি লেখা হয়েছে প্রধানত পশ্চিমাদের উদ্দেশ্যে, যারা আল-কায়দাকে ভুল বোঝার ফলে তাদের পাতানো ফাঁদে পা দিয়ে এক ক্ষয়কারী যুদ্ধের চোরাবালিতে আটকে পড়েছে এবং বারংবার নিজেদের ভুল নীতির কারণে সেই চোরাবালির আরও গভীরে তলিয়ে যাচ্ছে। লেখকের উদ্দেশ্য বলতে গেলে পশ্চিমা নীতিনির্ধারকদের সামনে আল-কায়েদার সঠিক রূপ ও প্রকৃতিকে তুলে ধরা, যেন তারা নিজেদের ভুল নীতি থেকে সরে এসে সুনিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে নিজেদের ও তাদের জনগণকে রক্ষা করতে পারে।

বইটি এতই জনপ্রিয়তা পেয়েছে যে, আল-জাজিরার তথ্যমতে এখনো পর্যন্ত পনেরোটি ভাষায় এটি রূপান্তরিত হয়েছে। ব্রিটেন ভিত্তিক সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন 'দ্য স্পেকট্যাটর' (THE SPECTATOR)-এর মতে, 'আল-কায়েদার রোমাঞ্চকর ইতিহাস এর চাইতে ভালো আর কোথাও বর্ননা করা হয়নি।' ব্রিটিশ পলিটিশিয়ান এবং সাবেক মেম্বার অফ পার্লামেন্ট টনি বেন (Tony Benn) বইটি সম্পর্কে মন্তব্য করেন, 'এখন পর্যন্ত এই বিষয়ে সেরা বই'। বইটিকে বাংলাভাষী পাঠকের পাঠসম্ভারে যুক্ত করার আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসের মাধ্যমে হয়তো বিশ্বের ষোলোতম ভাষায় এর অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে।

উল্লেখ্য, এটি আমার প্রথম প্রকাশিত বই হলেও ক্রমিকমান হিসেবে তৃতীয় অনুবাদ। প্রথম অনুবাদ Michael Scheuer এর 'Osama Bin Laden' 'ওয়ার্ল্ড'স মোস্ট ওয়ান্টেড ম্যান' নামে প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। দ্বিতীয় অনুবাদ (দ্বৈত) Scott Horton এর 'Fool's Errand: Time to End the War in Afghanistan' অতিসত্বর প্রকাশিত হবে আশা করছি। উল্লিখিত বই দুটিতে পাঠকদের বোঝার সুবিধার্থে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে টীকা, পরিশিষ্ট এবং পরিমার্জন আবশ্যক বিধায় তৃতীয় অনুবাদটিই প্রথম প্রকাশিত হলো। বইটির সম্পাদনা ও প্রকাশনায় যাদের চিন্তা ও পরিশ্রম ব্যয় হয়েছে, তাদের সকলের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সবশেষে কামনা করব বইটি সর্বমহলে সমাদৃত হোক এবং ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করুক, যেন এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ভবিষ্যতে আরও রোমাঞ্চকর বই উপহার দিতে পারি।

ধন্যবাদান্তে,
সিদ্দিক ইবনে মুসা
নভেম্বর, ২০২১

মুখবন্ধ

৭ জুলাই ২০০৫ সালে লন্ডনে আত্মঘাতী বোমা হামলার মৃতদেহ এবং ধ্বংসলীলা তিক্তভাবে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আল-কায়েদা আজ অবধি পশ্চিমা নিরাপত্তা এবং স্থিতিশীলতার ওপর সবচেয়ে শক্তিশালী হুমকি হিসেবে আছে। আমার মতে, পশ্চিমা সরকারব্যবস্থাগুলো বিশেষ করে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ এবং ব্রিটেনের প্রেসিডেন্ট টনি ব্লেয়ার এই হুমকির মাত্রা, এর উত্থানের উৎস এবং একে মোকাবিলা করার পন্থা সম্পর্কে মোটেই অবগত নন।

ত্রিশ বছর যাবৎ লন্ডনে বসবাসরত একজন আরব মুসলিম এবং মধ্যপ্রাচ্য রাজনীতি বিশেষজ্ঞ একজন সাংবাদিক হিসেবে আমার বিশ্বাস, এই বইয়ে আমি আল-কায়েদার একটি অনন্য বিশ্লেষণ এবং পশ্চিমা সভ্যতায় এর প্রভাবকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছি। আমি মুসলিম এবং পাশ্চাত্যসভ্যতা—দুটো সম্পর্কেই জ্ঞান রাখি এবং আমার বিশ্বাস—'মোকাবিলা নয় বরং সমঝোতাই একমাত্র পথ'। পশ্চিমারা যদি প্রকৃতই আল-কায়েদার হুমকি থেকে বাঁচতে চায়, তবে প্রথমে তাদেরকে এর প্রকৃতি ও রাজনৈতিক ভিত্তিকে বুঝতে হবে, যেটা ইতিমধ্যেই সমগ্র বিশ্বব্যাপী অসংখ্য ফ্র্যাঞ্চাইজি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। তাদেরকে অবশ্যই জানতে হবে, কীভাবে ন্যায়সংগত ক্ষোভের প্রতিক্রিয়া দেখাতে হয় এবং অর্থপূর্ণ সমঝতায় পৌঁছুতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় ভূমিকা পালনের জন্যই বক্ষ্যমাণ বইয়ে আল-কায়েদার উৎপত্তি, সদস্য সংখ্যা, তাদের লক্ষ্য, প্রভাব এবং কৌশল সম্পর্কে বিশ্লেষণধর্মী এবং বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করা হয়েছে।

আল-কায়েদার এজেন্ডাকে আমি কোনোভাবেই অনুমোদন অথবা সমর্থন করি না। এই নেটওয়ার্কটির বিভিন্ন দিক আলোচনার মাধ্যমে—যেটা এত গভীরভাবে এর পূর্বে আমি কখনো আলোচনা করিনি—আমি কেবল চাচ্ছি সেগুলোকে সকলের সামনে উন্মোচিত করতে এবং যতটুকু সম্ভব এর পেছনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দাঁড় করাতে। আল-কায়েদা এবং এর নেতাদের নিয়ে আমার প্রত্যক্ষদর্শী জ্ঞান, আল-কায়েদার ক্যাম্প পরিদর্শন ও এর প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার এবং অনেক বছরের পর্যবেক্ষণ, অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতার ফলাফল হলো এই বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ। লন্ডনের সেই ভয়াবহ ঘটনাই প্রমাণ করে যে, আল-কায়েদা আরও বিবর্তিত এবং বিস্তৃত হয়েছে; এর দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বিদ্যমান এবং তারা ধৈর্য সহকারে এবং নাছোড়বান্দারূপে সেগুলো অর্জন করেই চলছে। আল-কায়েদার নতুন কাঠামোতে ছোট ছোট স্বতন্ত্র গ্রুপ বিদ্যমান, যারা তাদের ভাবাদর্শ ধারণ করে এবং মূল নেতৃত্বের সাথে সামান্য বা একেবারেই সরাসরি সম্পৃক্ততা না রেখে

স্থানীয়ভাবে গঠিত হয় এবং স্বাধীনভাবে কার্য সম্পাদন করে থাকে। এগুলো মোটেও তাদের দুর্বল হওয়ার লক্ষণ নয়—যেমনটা অনেকেই ধারণা করে রেখেছে। অনেক বিশেষজ্ঞই এরূপ ধারণা উপস্থাপন করতে চায়, কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ এর বিপরীত। সমান্তরালভাবে এবং দ্রুতগতিতে বিস্তৃত হয়ে দিনে দিনে আল-কায়েদা আরও বড় এবং আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে। এর ভাবাদর্শ এবং স্ট্র্যাটেজি ইন্টারনেটে ব্যাপকভাবে সহজলভ্য, যেটা কোনো লাইসেন্স বা অনুমোদন ছাড়াই কোনো ব্যক্তি বা গ্রুপ অনুসরণ করতে পারছে এবং এর কাঠামোর মধ্যে থেকেই সফলভাবে অপারেশন পরিচালনা করছে।

জর্জ ডব্লিউ বুশ প্রায়ই বলেন যে, সেখানকার আল-কায়েদার সাথে লড়াই করে এই নেটওয়ার্কের আমেরিকায় আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যই তিনি ইরাকে আমেরিকান সৈন্য পাঠিয়েছেন। অথচ ইরাক আগ্রাসনের আড়াই বছর পরও আল-কায়েদা কেবল আমেরিকার বন্ধু আরবদেশগুলো—যেমন মিশরের তাবা এবং শারম-আল-শেইখ, জর্ডানের আকাবা, মরক্কোর কাসাব্লাঙ্কা প্রভৃতি জায়গায় হামলার সক্ষমতাই অর্জন করেনি; বরং ইস্তাম্বুল, মাদ্রিদ এবং লন্ডন হয়ে স্বয়ং এখন আমেরিকার ঘাড়ের ওপর তপ্ত নিশ্বাস ছাড়ছে।

ইরাকে আমেরিকার সামরিক ব্যয় ইতিমধ্যেই ২৫০ বিলিয়ন ডলারে ঠেকেছে। কিন্তু এই ব্যয়বহুল 'ওয়ার অন টেরর' এর পরও আল-কায়েদাকে অজেয় ও দুর্দান্ত বলেই মনে হচ্ছে। বাস্তবিকপক্ষে, তাদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধকেই তারা নিজেদের লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছে। ইরাককে তারা তাদের প্রশিক্ষণ শিবির হিসেবে ব্যবহার করছে এবং আমেরিকার বৈদেশিক নীতিই আল-কায়েদার এযাবৎকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রিক্রুটমেন্ট অফিসার হিসেবে কাজ করছে।

আল-কায়েদাকে তার অক্সিজেন সরবরাহ ব্যাহত করার উদ্দেশ্যে মুসলিমবিশ্বে মধ্যমপন্থা বিকাশের নামে এবং চরমপন্থা দূরীভূত করার লক্ষ্যে হাস্যকরভাবে আমেরিকান এবং ব্রিটিশ সরকার বরং এর উল্টোটাই করে চলছে। এর বিপরীতে আল-কায়েদাই বিভিন্ন উপায়ে পশ্চিমা সমাজগুলোর পরিবর্তনকেও প্রভাবিত করছে। এর সুস্পষ্ট উদাহরণসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আমেরিকা এবং ব্রিটেনে বিভিন্ন কঠোর আইন প্রণয়নকে উদ্দীপিত করা এবং ২০০৪ সালে স্পেনের সাধারণ নির্বাচনে সরকারে পরিবর্তন আনা।

'মুসলিম মাত্রই আমেরিকার জনগণ বা পশ্চিমা সভ্যতাকে ঘৃণা করে'—এরূপ যেকোনো ধারণাই ভ্রান্ত এবং বিপজ্জনক। মুসলিমরা মূলত যে বিষয়টা ঘৃণা করে, সেটা হলো তাদের বৈদেশিক নীতি। কেবল মুসলিমরাই এরূপ ঘৃণা পোষণ করে না, বরং অন্য আরও অনেকেই করে। উদাহরণস্বরূপ, আরব লীগ এবং দক্ষিণ

আমেরিকার দেশগুলো থেকে ৩৩ জন নেতা ২০০৫ সালের মে মাসে প্রথমবারের মতো ব্রাজিলে একত্রিত হয়েছিল। যেটাকে দেখা হয়েছিল আমেরিকার বৈশ্বিক কর্তৃত্বের বিপরীতে নতুন জোট গঠনের একটি ধাপ হিসেবে। এ ছাড়াও আমেরিকার আগ্রাসনকে সমর্থন করে, ইউরোপে এরূপ দেশ—যেমন স্পেন, গ্রীস প্রভৃতি দেশের সংখ্যা শতকরা ১০ ভাগেরও কম। দুটি পক্ষের মধ্যে সমানে সমান বিরোধিতা এটাই প্রকাশ করে যে, বিশ্ব এখন সভ্যতার সংঘর্ষে (Clash of Civilization) লিপ্ত। অপরদিকে বর্তমান সময়ে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো মুসলিম সভ্যতার পক্ষে বলার মতো কেউ নেই, যদিও মাঝেমধ্যে কেবল পশ্চিমাপন্থি দুর্নীতিবাজ স্বৈরাচারীরা গণতান্ত্রিক এবং পুঁজিবাদী উপায়ে এর পক্ষে বলার প্রয়াস করে।

আল-কায়েদা সংগঠনটি হয়তো-বা বিবর্তিত হয়েছে; কিন্তু তাদের অভিযোগ এবং দাবি-দাওয়াসমূহের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। পশ্চিমা নেতাদের উচিত এটিকে উপেক্ষা না করে বরং এর গুরুত্ব উপলব্ধি করা। অথচ টনি ব্লেয়ার তা উপেক্ষা করেছে এবং লন্ডনের বোমা হামলাটি যে মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকান প্রকল্পে তার সহায়তার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত, এটা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। তাহলে কেন স্প্যানিশরা ২০০৪ সালের ১০ মার্চে তাদের কমিউনিকেশন সিস্টেমের ওপর চালানো ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের জন্য এরূপ সম্পৃক্ততাকে দায়ী করেছিল এবং ভোটের মাধ্যমে সেই সরকারে পরিবর্তন এনেছিল যেটা কিনা ইরাকে আমেরিকার আগ্রাসনকে সমর্থন দিত? কেনই-বা ওসামা বিন লাদেন প্রশ্ন রাখেন, আল-কায়েদা কি সুইডেনের মতো দেশেও হামলা চালায়নি?

এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য কাউকে খুব বিচক্ষণ অথবা বিজ্ঞ বিশ্লেষক হতে হয় না। ওসামা বিন লাদেন এবং আল-জাওয়াহিরি এর কারণসমূহ সম্ভাব্য সকল বোধগম্য ভাষায় বারংবার ব্যাখ্যা করেছেন এবং বলে দিয়েছেন যে, মুসলিমদের রক্তের বদলা নিতে এসব রক্তাক্ত আক্রমণও অবিরাম চলতে থাকবে।

২০০৪ সালের ৪ নভেম্বরের মার্কিন নির্বাচনের ৫ দিন পূর্বে আমেরিকান জনগণের উদ্দেশে বিন লাদেনের বার্তাকে স্মরণ করুন। এতে তিনি ১১ সেপ্টেম্বরের হেতু ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, আমেরিকার সাথে তার বৈরিতার সূত্রপাত ঘটেছে ১৯৮২ সালেই, যখন আমেরিকা ইসরাইল কর্তৃক লেবানন আগ্রাসনকে অনুমোদন দেয় এবং আমেরিকা তাদের ষষ্ঠ বহরের মাধ্যমে সেটাতে সহায়তা করে। সেই বার্তার একাংশে উঠে এসেছে—

> 'আমি সেসব মর্মস্পর্শী দৃশ্য, রক্ত, ছিন্নভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, সর্বত্র নারী ও শিশুদের কাতরানো কখনই ভুলে যেতে পারি না; ঘরবাড়িগুলোকে তাদের

বাসিন্দাসহই ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল এবং উঁচু উঁচু স্থাপনাসমূহ চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়া হয়েছিল। যখন আমার লেবাননের ধ্বংসস্তূপের কথা মনে হয়, সাথে সাথেই আমার এটাও মনে হয় যে, আমাদেরও উচিত সেই একই উপায়ে সেসব নিপীড়নকারীদের শাস্তি দেওয়া এবং আমাদেরও উচিত আমেরিকান স্থাপনাগুলোও সেভাবেই ধসিয়ে দেওয়া।'

আল-জাজিরা সম্প্রচারিত সেই একই বার্তায় বিন লাদেন সিনিয়র বুশ কর্তৃক ইরাক অবরোধেরও তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন, যার কারণে লক্ষ লক্ষ ইরাকিকে মৃত্যুমুখে পতিত হতে হয় এবং যেটি মানব-ইতিহাসে বিদিত শিশুদের ওপর চালানো সবচেয়ে বড় গণহত্যা। এবং জুনিয়র বুশ কর্তৃক ইরাকে লক্ষ লক্ষ পাউন্ড বোমা এবং বিস্ফোরক নিক্ষিপ্ত করে লক্ষ লক্ষ শিশু হত্যারও নিন্দা জানান, যেটি করা হয়েছিল কেবল পুরোনো এক দালালকে সরিয়ে একটি নতুন পুতুল সরকার প্রতিস্থাপনের জন্য, যারা ইরাকের তেল অপহৃত করতে এবং অন্যান্য নিপীড়ন চালাতে সহায়তা করবে।

তবে আমি সর্বদাই সত্যিকারের নিন্দা জানাই নিরীহ পশ্চিমা জনগণের ওপর আল-কায়েদার এসব হামলার। আমি আমার যৌবনের বেশিরভাগ সময় লন্ডনে কাটিয়েছি এবং আমি এই শহরের মানুষদের ভালোবাসি। আমি পশ্চিমা গণতন্ত্র, সভ্যতা, স্বাধীন বিচারব্যবস্থা, নাগরিক সুবিধা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সুযোগের সমতার তারিফ করি এবং সমর্থন করি।

আমার ধারণা মতে, প্রেসিডেন্ট বুশ এবং প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের মতো নেতৃবৃন্দ কর্তৃক তাদের জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রণীত পদক্ষেপসমূহ পুরোপুরিভাবে ভুল এবং এ সবকিছুকেই আল-কায়েদা তাদের মাস্টারপ্ল্যান বাস্তবায়নে কাজে লাগাচ্ছে। সেসবই আমি এই বইয়ে আলোচনা করেছি। ওসামা বিন লাদেন নিশ্চিতভাবেই সঠিক সময় তাদের সেসব মারাত্মক বিচ্যুতিসমূহকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হবেন না।

আল-কায়েদা বর্তমানে কোন অবস্থানে আছে বা এটি কোন দিকে ধাবিত হচ্ছে; এর লক্ষ্য কী এবং সামর্থ্য কীরূপ; তাদের অভিযোগ এবং চ্যালেঞ্জ এর সামনে পশ্চিমাদের করণীয় কী—এসব বিষয় তুলে ধরাই বক্ষ্যমাণ বইয়ের উদ্দেশ্য। আমি এই বইয়ে ইরাকে তাদের দুর্দান্ত অভিযানসমূহকেও বিবেচনায় এনেছি এবং দেখানোর চেষ্টা করেছি, কীভাবে এই দেশটি আমাদের দেখতে পাওয়া সবচেয়ে নির্মম এবং আক্রমণাত্মক আল-কায়েদা যোদ্ধাদের উৎপাদনকারী কারখানায় পরিণত হলো। অধিকন্তু আন্তর্জাতিক অপারেশন পরিচালনার জন্য ইরাক বর্তমানে আল-কায়েদার একটি প্লাটফর্মে পরিণত হয়েছে। আমি লক্ষ করেছি, সাম্প্রতিক সময়ে মিশর, মাদ্রিদ, লন্ডন প্রভৃতি হামলাগুলোর পেছনে ইরাক এবং সেখানকার

আল-কায়েদা নেতৃবৃন্দ—যেমন আবু মুসআব আল-জারকাভি, আবু মুসআব আল-সুরি প্রমুখের সরাসরি সম্পৃক্ততা বিদ্যমান। আল-কায়েদা কেবল পশ্চিমা বিশ্বকেই অস্থিতিশীল করতে চাইছে না বরং তারা মধ্যপ্রাচ্যেও এরূপ করতে চাইছে। বিভিন্ন অধ্যায়ে আমি ইন্টারনেটের ভূমিকা এবং যুদ্ধের একটি সেক্টর হিসেবে সাইবার জিহাদের উত্থান নিয়ে আলোচনা করেছি, আত্মঘাতী হামলার ধারণা এবং এর ইতিহাসকে তুলে ধরেছি; আল-কায়েদার অর্থনৈতিক স্ট্র্যাটেজি বর্ণনা করেছি, বিশেষ করে যার কারণেই সৌদি আরব এবং আমেরিকা আল-কায়েদা নিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত। সর্বোপরি আল-কায়েদা মধ্যপ্রাচ্যের নিপীড়ক শাসনব্যবস্থাসমূহে অন্তর্বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য এবং তেলের দাম বৃদ্ধি করে ও বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ক্ষয়কারী যুদ্ধে পশ্চিমাদের জড়িয়ে রাখার মাধ্যমে অর্থনীতিকে শুকিয়ে ফেলে দেউলিয়াত্বের দিকে ঠেলে দেওয়ার লক্ষ্যে যে উচ্চ মানের কলা-কৌশল অনুসরণ করছে, তার বিবরণ তুলে ধরেছি।

বইটি শুরু হয়েছে ওসামা বিন লাদেনের সাথে ব্যক্তিগতভাবে আমার সাক্ষাৎ এবং সেই ভ্রমণের বর্ণনা নথিভুক্ত করার মাধ্যমে। তিনি তখনই বিশ্বের মোস্ট ওয়ান্টেড ছিলেন এবং আরও বেশি মোস্ট ওয়ান্টেড হওয়ার দিকে এগিয়ে চলছিলেন। যেসব ব্যক্তিদের নিয়ে সবচেয়ে বেশি লেখা হয় এবং যারা সবচেয়ে আলোচিত-সমালোচিত, তিনি তাদের মধ্যে একজন। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে বিপরীত মনে হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় তাকে নিয়ে রচিত গ্রন্থসমূহ বিভ্রান্তিকর। আল-কায়েদার প্রতিষ্ঠাতা এবং অগ্রদূতদের প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত না করে আল-কায়েদার কোনো ইতিহাসকে তুলে ধরা সম্ভব নয়। এই বইয়ের প্রথম দুই অধ্যায়ে তার চিত্রায়ণ এবং আধুনিককালের জিহাদের সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং প্রধান বক্তা হিসেবে তার ক্রমবিকাশকে তুলে ধরা হয়েছে। যেসব পাঠক বিন লাদেনের জীবনী সম্পর্কে অবগত আছেন, তারাও এটিকে এখানে নতুনরূপে দেখতে পাবেন।

মধ্যপ্রাচ্যে আমার ভ্রমণসমূহের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমি দেখেছি যে, বিশ্বের ১.৩ বিলিয়ন মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিশাল অংশের মধ্যে বিন লাদেন এবং আল-কায়েদার প্রভাব ক্রমবর্ধমান। অধিকন্তু, আল-কায়েদার সাথে লড়াইটি সামঞ্জস্যহীন। আত্মপ্রসাদে মগ্ন পশ্চিমাদের থেকে আশা করা যায় না যে, এই যুদ্ধে তারা জয়ী হবে। অন্যদিকে বিন লাদেন এবং আল-কায়েদা তাদের দিক থেকে ধৈর্যশীল এবং তাদের দীর্ঘস্থায়ী স্ট্র্যাটেজি এবং একনিষ্ঠ ভাবাদর্শ বিদ্যমান। যদি পশ্চিমারা আল-কায়েদার সাথে লড়তেই চায়, তবে প্রথমে তাদের উচিত একে বুঝে নেওয়া। আল-কায়েদাকে তাচ্ছিল্য করা তাদের জন্যই বিপজ্জনক, কারণ এটি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার মতো কোনো বিষয় নয়।